PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
WEBSITE: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

একটি হারিয়ে যাওয়া গল্পের পুনর্জন্ম

ড. অন্তরা চৌধুরি

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/অমর-মিত্রের-গাঁওবুড়ো-একটি-গল্পের-পুনর্জন্ম3.pdf

সারসংক্ষেপ: বড়োবাবুই মুশকিল আসান। তাঁকে বললেই সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু এই বড়োবাবু আসলে কে? গাঁওবুড়ো কী দেখা পেল বড়োবাবুর? না কি বড়োবাবু শেষমেশ মরীচিকা হয়েই থেকে গেলেন!

সূচক শব্দ: অমর মিত্র, গাঁওবুড়ো, ফকিরচাঁদ, ও হেনরি, দ্য কমন পত্রিকা, আমেরিকা, জীবনদেবতা, অলমাইটি।

গল্প নির্মাণের গল্প

সময় সত্তরের দশক। তরুণ লেখক একদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে লিখলেন 'গাঁওবুড়ো' নামক একটি গল্প। কথা ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকার একটি শাখা 'অমৃত' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হবে। সেই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্থানাভাবে গল্পটি পুজো সংখ্যায় জায়গা পায়নি। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল 'অমৃত' পত্রিকার সাধারণ সংখ্যায়।

কিন্তু এমন অসাধারণ একটি গল্পকে পুজো সংখ্যায় স্থান দিতে না পারায়, লেখকের কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন ওই পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। দিয়েছিলেন নিজের লেখা বিশিষ্ট উপন্যাস 'কুবেরের বিষয়আশয়।' সেই ছিল প্রথম পুরস্কার — একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছ থেকে একজন ভাবী লেখকের পাওয়া। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। ১৯৯০ সাল নাগাদ গল্পটির অনুবাদ করে নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য অকাদেমির ভারত-আমেরিকা লেখক-কর্মশালায়। গল্পটি অনুবাদ করেছিলেন লেখকের বন্ধু অনীশ গুপ্ত। সেখানে গল্পটি পাঠ করা হয়। সেই কর্মশালায় এসেছিলেন আমেরিকান লেখক ও এক রাইটিং স্কুলের প্রিন্সিপাল কিট রিড। তিনি লেখকের এই গল্প শুনে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখককে চাকরি ছেড়ে পেশাদারি লেখক হবার পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারতের মতো দেশে লিখে সংসার চালানো শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভবও বটে।

এরপর গল্পটি নির্বাসিত হয়ে পড়েই ছিল। আবার বছর কুড়ি পরে। সময় ২০২০। চারিদিকে করোনার হাহাকার। এই অবস্থায় গল্পের অনুবাদটিকে লেখক আবার পাঠালেন সেই বন্ধুর কাছে। আবদার করলেন তাঁর এই অনুবাদটিকে যদি আরো একটু ঘষামাজা করে সুখপাঠ্য করে তোলা যায়! লেখকের আবদার মতো আরো স্মার্ট ঝকঝকে অনুবাদ করলেন লেখক বন্ধু অনীশ গুপ্ত। ইংরেজিতে গল্পটির

নাম দেওয়া হলো, 'দ্য ওল্ড ম্যান অফ কুসুমপুর'।[১] তারপর বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে সেই নবরূপে সজ্জিত গল্পটিকে লেখক পাঠালেন 'দ্য কমন' পত্রিকায়। গল্পটি পাঠানোর পর কেটে গেছে নয়-থেকে দশমাস। অবশেষে ২০২১এর মার্চ মাসে 'দ্য কমন' পত্রিকায় ছাপা হয় গল্পটি।

ওই বছরের অক্টোবর মাসের শেষের দিক। লেখকের তাড়াতাড়ি শোওয়ার অভ্যাস। রাত দশটার মধ্যেই তিনি শুয়ে পড়েন। তবু ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ মুঠোফোন নাড়াচাড়া করছিলেন। আর সেটা করতে গিয়েই ইমেল চোখে পড়ে। ইমেল পাঠিয়েছেন 'দ্য কমন' পত্রিকার চিফ এডিটর জেনি মিন্টন উইকলে। প্রথম ভারতীয় নাগরিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে 'গাঁওবুড়ো' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদের জন্য 'ও হেনরি' পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি।

এখন আর লেখকের নামটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র।

গাঁওবুড়োর কথকতা

এমন একটা বলিষ্ঠ গল্প এতদিন আমাদেরও চোখের আড়ালেই ছিল। পড়তে গিয়ে দেখলাম গল্পটির পরতে পরতে বিস্ময়। গল্পটি বেশ কয়েকটি বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে। এই গল্পের মূল চরিত্র ফকিরচাঁদ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় হেঁটে চলেছে এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য পূরণের আশায় সে জীবনের পথে যাত্রা করে। জীবনের সমস্ত না পাওয়াকে পাওয়ার জন্য, সমস্ত অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তি করার জন্য সে যাবে 'বড়োবাবু'র কাছে। দশ মাইল দূরে দুর্গাহুড়ি জঙ্গাল পেরিয়ে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কন্যাডিহা গ্রামে থাকেন ফকিরচাঁদের বড়োবাবু।

ফকিরচাঁদের ঝুলিতে অভিযোগের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তার চোখে ছানি, বৃদ্ধ শরীর, বউ মারা গেছে, ছেলেও অন্য মেয়েকে বিয়ে করে পালিয়ে গেছে। তাই ফকিরচাঁদ চায় বড়োবাবু যেন তার সমস্ত না-পাওয়াকে পাইয়ে দেন। তাহলে সে এই বয়সেও আরো একটা বিয়ে করবে, চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে, পৃথিবীটাকে দু চোখ ভরে দেখবে, তার ছেলে আবার বউকে ছেড়ে দিয়ে তার কাছে আবার ফিরে আসবে।

ফকিরচাঁদ পথ হাঁটে। রাস্তায় বেশ কিছু মানুষের সঙ্গো তার দেখা হয়। তাদের জীবনেও অনেক না-পাওয়া। তবুও তারা সেই না পাওয়ার সঙ্গোই একরকম মানিয়ে নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু কোনো মতে টিকে থাকাটাই তো বেঁচে থাকা নয়। জীবনের সুখটুকু গণ্ডুষভরে পান করতে না পারলে জীবনের সার্থকতা কোথায়! তাই তারা যখন গাঁওবুড়োর কাছ থেকে জানতে পারল যে তার বড়োবাবুর কাছে সকলের সব সমস্যার সমাধান আছে, তখন তারাও তাদের বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলল। তাদের জীবনেও অনেক বাধা। কেউ তার প্রিয়জনকে বিয়ে করতে পারে না, কেউ বা দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সমাজচ্যুত, কেউ বা জঙ্গালের বুকে নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে না। সকলের সমস্ত দুঃখকে বহন করে নিয়ে চলে ফকিরচাঁদ। তাদের আশ্বাস দিয়ে যায় বড়োবাবুর কাছ থেকে সে সব সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবে। সেই দিনটার জন্য, সেই ফকিরচাঁদের জন্য তারা যেন প্রতীক্ষা করে।

আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে — কে এই বড়োবাবু? কী তাঁর পরিচয়? বড়োবাবুর ব্যাখ্যা ফকিরচাঁদ নিজেই দিয়েছে —

'পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ ছড়ায়?
মেঘে ভর করি কে বরষে জল?
পুষ্প ফুটিলে সে গন্ধ ছড়ায়
মেঘে ভর করি সে বরষে জল।'[২]

ফকিরচাঁদের কথায়, 'তিনি পরিশ্রান্ত মানুষকে বিশ্রাম দেন। অফুরন্ত জীবনের কথা বলেন। অবলীলায় কত দুরূহ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। তিনি বড় মানুষ। বিশাল এক পুরুষ। রোগ শোক তাপে তাঁর কাছেই আশ্রয়।'

আসলে আমাদের সকলের মধ্যেই একজন ফকিরচাঁদ বাস করে। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় পৌঁছে গিয়েও আমরা ভাবি একটা ভালো দিন আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। একজন যুগপুরুষ, একজন কল্পতরু পুরুষ নিশ্চয়ই আসবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে যা ছিল তাঁর জীবনদেবতা বা অলমাইটি, অমর মিত্রের এই গল্পে গাঁওবুড়োর 'বড়োবাবু' সেই জীবন দেবতারই সদৃশ।

সেই জীবনদেবতা আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। সমস্ত না পাওয়াকে পাইয়ে দেবেন। শেষ বিচার নিয়ে সবার যে প্রত্যাশা আছে সব তিনি পূরণ করবেন। সেই দিনের নতুন সূর্য আমাদের জীবনের সব আঁধার দূর করে দেবে। যত খারাপের মধ্যে দিয়েই মানুষ দিন কাটাক, একটা ভালো দিন তার জীবনে আসবেই — সেই সুখস্বপ্ন দেখেই তো সে বেঁচে থাকে। অবলীলায় জীবনের জোয়ারভাঁটা হাসি মুখে পেরিয়ে যায়। আসলে প্রত্যেকের জন্যই মহত্তর কোনও সুখ আছে এই পৃথিবীতে। সেই জন্যই তো সে বেঁচে থাকে।

কিন্তু ফকিরচাঁদের আর শেষ পর্যন্ত বড়োবাবুর কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ এমন কোনো মানুষই নেই। কোথাও নেই। এমন মানুষ আজকাল আর কোথাও থাকে না। যিনি থাকেন তিনি আমাদের মগ্ন চৈতন্যে বাস করেন। বাস্তবে তাঁর অস্তিত্ব কোথাও নেই। ফকিরচাঁদের বিশ্বাস বাস্তবের মাটিতে ঠোক্কর খেতে খেতে ভেঙে যায়। সেই নদীর চরে সে তখন রিক্ত নিঃস্ব এক মানুষ যার স্বপ্ন ভেঙে গেছে —

'তখন অন্ধকারের পৃথিবীতে চাঁদ ভেসেছে গেরুয়া বর্ণের ডিম্বাকার।... গাঁওবুড়ো দ্রুত দৌড়তে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে বালুচরে। আকাশের নীচে পৃথিবীর উপর পড়ে থাকে। সব নৈঃশব্দ ডোবে...।'[৩]

অমর মিত্রের গল্পের ফর্ম ও সমকালীনতা

অমর মিত্রের গল্পের এই ফর্ম তাঁর জীবন চর্চা থেকেই এসেছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮/৭৯ পর্যন্ত লেখা তাঁর গল্পগুলিতে এই বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। চাকরি করার সময় বিভিন্ন প্রান্তিক জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। তদন্তে গেলে বা ক্যাম্প অফিসে পৌঁছতে গেলে লেখককে অনেকটা দূর হাঁটতে হতো। হাঁটার সময় বিস্ময়ে বিভোর হয়ে থাকতেন সেই যাত্রাপথের চারপাশটা দেখে। সেই যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাটুকু লেখকের অবচেতনে বসবাস করত। গল্প লেখার সময় সেই অভিজ্ঞতা এসে ধরা দেয় লেখকের কলমে। কিছুটা কল্পনা, কিছুটা বাস্তব মিলিয়েই এই গল্প। এই গল্প ঝাড়গ্রামের প্রেক্ষাপটে লেখা। বড়াম থান, রঙ্কিনী দেবী, নানা পরব — এই সমস্ত উপকরণ লেখক চাকরি জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

এই গল্প জীবনের পথে যাত্রার গল্প। এই গল্প সাহিত্যের পথে যাত্রার গল্প। কিন্তু গন্তব্য অনিশ্চিত! তাই এই গল্পের গাঁওবুড়ো বা ফকিরচাঁদের কন্যাডিহি যাত্রা যেন লেখকের নিজেরই জীবন পথে যাত্রা। লেখকের অন্যান্য গল্প 'মেলার দিকে ঘর' বা 'রাজকাহিনি' গল্পেও এমন যাত্রা ছিল। করম পরবের লোককাহিনিতে ধর্মু আর কর্মুও এমনভাবেই জীবনের পথে যাত্রা করেছিল। লেখক এই ধর্মু আর কর্মুর কাহিনি পড়েছিলেন সুধীর করণের 'সীমান্তবাংলার লোকযান' গ্রন্থে এবং সেই কাহিনি শুনেছিলেন স্থানীয় মানুষের মুখে।

অমর মিত্রের গল্পের উপকরণ বিপন্ন মানুষের যাপিত জীবন। ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা বারবার উঠে আসে তাঁর গল্পে। তাঁর লেখায় বারবার ফিরে আসে নিরুদ্দেশ যাত্রার ভাবনা। গল্প লেখার ক্ষেত্রে অমর মিত্র যদি গল্পের ফর্ম খুঁজে না পান, তাহলে বিষয় তৈরি হয় না। এই রকম একটি গল্প 'মেলার দিকে ঘর' পড়লে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। তারপর আবার এক সময় গল্পের ফর্ম বদলে যায়। আসলে এক একজন লেখক এক এক ভাবে গল্প লেখেন। কেউ সমগ্র গল্পটাই আগে মনে মনে গেঁথে নেন। কেউ আবার গল্প লিখতে লিখতে এগিয়ে চলেন। শেষ যে কোথায় হবে সেটা লেখকেরও অজানা। মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস তাঁর লেখনিতে ধরা পড়ে।

সেকালের গল্প একালেরও

আসলে ফকিরচাঁদের মতো আমরাও কল্পনা করতে ভালোবাসি। আমাদের জীবনের সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির কাছে যাওয়ার জন্য দিন গুণি। কিন্তু দিনের শেষে নিজেকেই নিজের কাছে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। তাই আমরা সকলেই গাঁওবুড়ো। আর আমাদের মধ্যেই সেই বড়োবাবুর বাস। শুধু তাঁকে নিজের মধ্যেই খুঁজে নিতে হয়, খুঁজে পেতে হয়।

সেই সময়ের নিরিখে গল্পটি ছিল একেবারেই প্রাসঙ্গিক। সময় বদলেছে। গ্রাম গঞ্জের চেনা পরিবেশও বদলেছে। বদলেছে আশা আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু গল্পটিকে এখনকার সময়ের নিরিখেও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। তাই নতুন করে তার অনুবাদ হয়। নতুন করে সে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ে অনন্ত আকাশে। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের গল্প নতুন করে সমাদৃত হয় বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায়। এ শুধু গাঁওবুড়োর ফিরে আসা নয়। এ যেন এক হারিয়ে যাওয়া গল্পেরও পুনর্জন্ম।

তথ্য সহায়তা:

১। BANGLA NEWS24.com: **https://www.banglanews24.com/art-literature/news/bd/922674.details**

২। গুরুচণ্ডাল: **https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=19541**

৩। তদেব।

তথ্যঋণ:

স্বরূপ কথা লাইভ: #SwarupKatha #AmarMitra #OHenryAward

লেখক পরিচিতি:

ড. অন্তরা চৌধুরী: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক স্নাতক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। 'বাংলা হাসির গল্প ও তার বিবর্তন' বিষয়ে গবেষণা করে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গবেষণাধর্মী ও ফিচারধর্মী রচনা অবিরত লেখেন।

—